ইউনিট

৯

বীমা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা

(Basic Concepts of Insurance)

ভূমিকা

মানব জীবন জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তায় ভরপুর। প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে আজ অবধি ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়েই মানব জীবন চলে আসছে। বীমা মানব জীবনের সকল ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তাকে মোকাবেলা করার একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

মানব জীবনের ন্যায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ও ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বিরাজমান। পন্য উৎপাদন থেকে শুরু করে ভোক্তার নিকট পৌঁছান পর্যন্ত ঝুঁকি বিদ্যমান। তাই বীমা অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে বিরাট ভূমিকা পালন করছে। দিন দিন বীমার পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। শুরুতে নৌ ঝুঁকিকে কেন্দ্র করে বীমা ব্যবস্থা গড়ে উঠলেও পরবর্তীতে জীবন বীমা, অগ্নিবীমা, সামাজিক বীমা প্রভৃতি বীমার উদ্ভব ঘটে। বীমা ঝুঁকি নিতে উৎসাহিত করে ফলে পৃথিবীর মানব জীবনে বয়ে আনে সাফল্য, স্বাচ্ছন্দ, সমৃদ্ধি এবং ভাবনা হীন সুখী জীবন।

এ ইউনিটে আছে-

- *বীমার সংজ্ঞা, গুরুত্ব ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*
- *বীমা চুক্তি, বৈশিষ্ট্য ও অপরিহার্য উপাদান এবং*
- *বীমার শ্রেণী বিভাগ।*

পাঠ ১ বীমার সংজ্ঞা, গুরুত্ব ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বীমার সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- বীমার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- বীমার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- বীমার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

বীমার সংজ্ঞা ঃ পূর্বের আলোচনায় আমরা জানতে পেরেছি যে মানব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদ্যমান ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তাকে হ্রাস বা লাভ করার জন্যই বীমা ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে। আধুনিক বিশ্বে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প খাতের ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তাকে মোকাবেলা করা এক যুগোপযোগী ও কার্যকরী হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

বিভিন্ন লেখক ও বীমা বিশেষত্ব বিভিন্ন সময়ে বীমার বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে এর কয়েকটি উল্লেখ করা হলো ঃ

অধ্যাপক I.M. Taylor- এর মতে, “বীমা চুক্তি হলো প্রিমিয়াম পরিশোধের প্রতিদানে একপক্ষ অপর পক্ষের সম্ভাব্য ক্ষতির ঝুঁকি গ্রহণের সম্মতি।”

অধ্যাপক মার্গারের মতে, “বীমা বলতে কোন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠির সম্মতি বা চুক্তিকে বুঝায় যার দ্বারা সাধারণ ভাবে ঐ সম্প্রদায়ের প্রতিটি সদস্যের কল্যাণ নিশ্চিত করা হয়।”

অধ্যাপক মার্ক গ্রীনি নিম্ন লিখিত ভাবে বীমার সংজ্ঞা প্রদান করেন: “বীমা হলো এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়কে একই ব্যবস্থাপনাধীনে একটা বৃহৎরূপে বিন্যস্ত করার মাধ্যমে একটা ক্ষুদ্র পরিসরে প্রধানত মাত্রা সাপেক্ষে সমাজের সার্বিক ক্ষতির ঝুঁকি হ্রাসে সহায়তা করে।”

অধ্যাপক মিশ্র বীমাকে নিম্নোক্ত দু'টি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সংজ্ঞায়িত করেছেন–

i) কার্যকরী বা Functional সংজ্ঞা ঃ বীমা বলতে এমন এক সমবায় মূলক কৌশলকে বুঝায় যার মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট ঝুঁকির ফলে সৃষ্ট ক্ষতিকে এমন সব ব্যক্তি বর্গের মধ্যে বন্টন করা হয়, যারা উক্ত ক্ষতির কারণে সরাসরি প্রভাবিত হয় এবং যারা উক্ত ঝুঁকির বিরুদ্ধে নিজেদের নিরাপত্তা বিধানে সম্মত হয়।

ii) চুক্তিগত সংজ্ঞা ঃ বীমা হলো এমন এক চুক্তি যাতে কোন নির্দিষ্ট দৈব দূর্ঘটনার ফলে সৃষ্ট ঝুঁকির জন্য বীমা গ্রহীতাকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রিমিয়াম হিসেবে পরিশোধের বিনিময়ে বীমাকারী বিপুল পরিমাণ অর্থ পরিশোধের নিশ্চয়তা দেয়।

উপরোউক্ত সংজ্ঞা সমূহের আলোকে আমরা বলতে পারি যে বীমা হলো দুটি পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তি যার এক পক্ষ তার সম্ভাব্য ঝুঁকি পুষিয়ে চলার জন্য অন্য পক্ষকে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করে এবং অপর পক্ষ উক্ত অর্থের বিনিময়ে তার ঝুঁকি গ্রহণ করে।

বীমার বৈশিষ্ট্য

আমরা যদি বীমার সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করি তবে বীমার কিচু বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখতে পাব। বীমার মধ্যে যে সকল বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো ঃ

১. একাধিক পক্ষ ঃ বীমা চুক্তিতে অন্ততঃ দুটি পক্ষ থাকে। যথাঃ বীমা গ্রহীতাও বীমাকারী। যে অর্থের বিনিময়ে অন্যের কাছে ঝুঁকি ছড়িয়ে দেয় সে বীমা গ্রহীতা। আর যে পক্ষ অর্থের বিনিময়ে অন্যের ঝুঁকি গ্রহণ করে তাকে বীমাকারী বলে।

২. নিশ্চয়তা প্রদান ঃ মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই অনিশ্চয়তা বিরাজমান। বীমা এ অনিশ্চয়তার ক্ষেত্রে আর্থিক নিশ্চয়তা প্রদান করে চুক্তির উপর নির্ভর করে।

৩. ঝুঁকির বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা ঃ বীমার উৎপত্তিই ঝুঁকিকে মোকাবেলা করার জন্য ঝুঁকিকে ভাগ করে দিয়ে হ্রাস করা।

৪. বীমা সরল বিশ্বাসের চুক্তি ঃ বীমার ক্ষেত্রে উভয় পক্ষকেই সরল বিশ্বাসে সকল গুরুত্ব পূর্ণ তথ্য খুলে বলবে। কোন তথ্য গোপন করা যাবে না।

৫. বীমা ক্ষতি পূরণের চুক্তি ঃ বীমার মাধ্যমে যতটুকু ক্ষতি হবে ততটুকু ক্ষতি পূরণ করা হবে। কোন লাভ করতে দেয়া হবে না।

৬. সমবায় পন্থা ঃ বীমার জন্মই সমবায় নীতির উপর। আজও সে নীতির উপরই বীমা ব্যবসা পরিচালিত হচ্ছে।

৭. ঝুঁকি বন্টন ঃ একজন বীমাকারী অন্যের ঝুঁকি গ্রহণ করে। যার কোন আর্থিক ক্ষতি হলে সে তার ক্ষতি পূরণ করে। এজন্য বীমা গ্রহীতাকে প্রিমিয়াম প্রদান করতে হয়। এভাবে ঝুঁকি সকলের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়।

৮. ঝুঁকি মূল্যায়ন ঃ ঝুঁকিকে পরিমাপ করে তার জন্য প্রিমিয়াম নির্ধারণ করা হয়। যত বেশী ঝুঁকি গ্রহণ করে তত বেশী প্রিমিয়াম আদায় করে থাকে।

৯. বীমা চুক্তি কোন জুয়া খেলা নয় ঃ জুয়া খেলার ক্ষেত্রে শুধু মাত্র ভাগ্যের উপর নির্ভর করে। কেউ কোন ঝুঁকি গ্রহণ করে না। এটা আইনে অবৈধ। বীমা অর্থের বিনিময়ে ঝুঁকি গ্রহণ করে, এটা বৈধ চুক্তি।

১০. বীমা কোন দাতব্য বিষয় নয় ঃ বীমা সেবা দান করে কিন্তু তার বিনিময়ে অর্থ আদায় করে থাকে অর্থাৎ প্রতিদান গ্রহণ করে, বিনা প্রতিদানে কোন বীমা হয় না।

বীমা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কয়েকটি পরিভাষা

বীমাকারী (Insurar) ঃ বীমা চুক্তি অনুযায়ী যে পক্ষ টাকার বিনিময়ে অপর পক্ষের ঝুঁকি গ্রহণ করে তাকে বীমাকারী বলে। বীমাকারী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে পারে।

বীমা গ্রহীতা (Insured) ঃ যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রিমিয়ামের বিনীময়ে নিজের ঝুঁকি অন্যকে হস্তান্তর করে তাকে বীমা গ্রহীতা বলে।

প্রিমিয়াম (Premium) ঃ যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বীমা গ্রহীতা এককালীন বা কিস্তিতে বীমা কারীকে প্রদান করে তাকে প্রিমিয়াম বলে। এটা এক কালীন, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক বা বাৎসরিক যে কোন কিস্তিতে প্রদান করা যেতে পারে।

বীমা পত্র ঃ যে লিখিত দলিলে বীমা চুক্তি সম্পাদিত হয় তাকে বীমা পত্র বলে। বীমা পত্রে বীমা সংক্রান্ত সকল শর্ত বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ থাকে।

একটি উদাহরণের মাধ্যমে বীমার বিভিন্ন পরিভাষা দেখান হলো ঃ ধরুন মিঃ জাফর ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানীর সাথে মাসিক ৫০ টাকা কিস্তিতে দশ বৎসর মেয়াদী ২,০০,০০০ টাকার একটি জীবন বীমা চুক্তিতে আবদ্ধ হলো। এক্ষেত্রে মিঃ জাফর বীমা গ্রহীতা, ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ বীমাকারী, ৫০০ টাকা মাসিক কিস্তি প্রিমিয়াম, আর যে চুক্তিটি সম্পাদিত হলো যাতে সকল শর্ত থাকবে তাকে বীমা পলিসি বা বীমা পত্র বলা হয়।

বীমার গুরুত্ব (Importance of Insurance)

আমরা পূর্বের আলোচনার মাধ্যমে জেনেছি যে বীমা ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষ তার ব্যক্তিক ও ব্যবসায়িক ঝুঁকি হ্রাস করে থাকে। ব্যক্তিগত, ব্যবসায়িক ও সমাজ জীবনের বিভিন্ন স্তরে বীমা আর্থিক নিরাপত্তা, নিশ্চয়তা ও প্রতিরক্ষা প্রদান করে আর্থিক ব্যবস্থাকে ঝুঁকিমুক্ত ও নিরাপদ করে তোলে।

যাই হোক আধুনিক জটিল ও প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায় জগতে এবং মানুষের জীবনে বীমার গুরুত্ব সম্পর্কে নিম্নে বর্ণনা করা হলো ঃ

(ক) ব্যাক্তিগত ক্ষেত্রে বীমার ভূমিকা ও তাৎপর্য (Importance to an individual) ঃ মানুষের পরিবারের কোন উপার্জনক্ষম ব্যক্তির মৃত্যু বা যেকোন দূর্ঘটনার কারণে উক্ত পরিবারটি আর্থিক সংকটে পতিত হয়, বীমা ব্যবস্থা এসব ক্ষেত্রে মানুষকে

সামান্য পরিমাণে হলেও আর্থিক সংকট মুক্ত করতে সচেষ্ট হয়। ব্যক্তিগত বীমার মধ্যে রয়েছে- জীবন বীমা, দূর্ঘটনা বীমা ও স্বাস্থ্য বীমা।

একজন ব্যক্তি বীমা ব্যবস্থার মাধ্যমে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সুবিধা ভোগ করে থাকে-

i) জীবন বীমা গ্রহণকারীর অকাল মৃত্যুতে তার উত্তরাধীকারীগণ নিরাপত্তা সুবিধা ভোগ করে।

ii) অনুরূপভাবে অগ্নি-বীমা, নৌ-বীমা, দূর্ঘটনা বীমা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দূর্ঘটনা ঘটলে বীমা গ্রহীতা আর্থিক নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তার সুবিধা পায়।

iii) কোন বন্ধকী সম্পত্তি বীমা করা থাকলে তার যথাযথ সুরক্ষা বীমা বিধান করে।

iv) এছাড়াও পারিবারিক চাহিদা পূরণ, বৃদ্ধ বয়সের প্রয়োজন, অন্তবর্তীকালীন ক্ষতিপূরণ, শিক্ষা, বিবাহ, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া ইত্যাদি বিবিধ প্রয়োজনে আর্থিক নিরাপত্তা প্রদানের মাধ্যমে বীমা একজন বীমাগ্রহীতার বিবিধ চাহিদা পূরণ করে।

(খ) ব্যবসায়-এর ক্ষেত্রে গুরুত্ব (For business) ঃ ব্যবসায়ের প্রতিক্ষেত্রেই ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা থাকার কারণে ব্যবসায়কে ঝুঁকির খেলা (Game of risk) ও বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- বাজারদর কমে খাওয়া, পণ্যদ্রব্য ও উৎপাদনের বা সরবরাহের ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়া (ধর্মঘটের কারণে), আগুন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা যুদ্ধবিগ্রহের কারণে আভ্যন্তরীণ বা আন্তর্জাতিক বাজারে অচলাবস্থা দেখা দিতে পারে, পণ্য পরিবহনকালে দূর্ঘটনা ঘটতে পারে, গুদামে আগুন লাগতে পারে অথবা চুরি-ডাকাতি বা রাহাজানি জনিত কারণে আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। বীমার সাহায্যে এই সমস্ত ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা হ্রাস করা যায়। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বীমার প্রচলন সবচেয়ে বেশী। ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি বৃদ্ধিতে বীমা নিম্নলিখিতভাবে সহায়তা করে। যথাঃ

i) বীমা আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ব্যবসায়িক ক্ষতির অনিশ্চয়তা দুর করে।

ii) যেকোন আর্থিক ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা দূর করার ক্ষেত্রে সহায়তার মাধ্যমে বীমা ব্যবসা-বাণিজ্যের কার্যাবলীতে গতিশীলতা বজায় রাখে এবং ফলশ্রুতিতে ব্যবসায়িক দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

iii) ব্যবসা-বাণিজ্যের বীমা গ্রহণ করা থাকলে ঐ প্রতিষ্ঠানের ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা ও সুবিধা উভয়ই বৃদ্ধি পায়।

ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সাধারণত যে ধরনের বীমা প্রচলিত সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- নৌ-বীমা, অগ্নি-বীমা, দূর্ঘটনা-বীমা, রপ্তানী-বীমা ইত্যাদি।

(গ) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বীমার গুরুত্ব (For economy) ঃ আধুনিক অর্থনীতিতে বীমার গুরুত্ব ও ভূমিকা অপরিসীম। ব্যক্তিগত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বীমার ভূমিকা অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক। অর্থনৈতিক উন্নয়নে বীমার ভূমিকা নিম্নরূপ-

i) বীমা কোম্পানীগুলো প্রিমিয়াম আকারে সারা দেশ হতে অর্থসংগ্রহ করে এবং তা বিভিন্ন লাভজনক খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে।

ii) বীমা কোম্পানী ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় খাতের সকল প্রকার উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের সার্বিক আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতির ঝুঁকি বহন করে। ফলে নতুন নতুন শিল্প-কারখানা গড়ে উঠে, আয় বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত ও ত্বরান্বিত হয়।

iii) বীমাকারী প্রতিষ্ঠানগুলো পরোক্ষভাবে জাতীয় সম্পদের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব পালন করে।

iv) কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, পরিবহনসহ সকল উৎপাদনশীল খাত বীমা সুবিধার আওতায় এসে ঝুঁকিমুক্ত পরিবেশে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হয়।

(ঘ) সামাজিক ক্ষেত্রে বীমার ভূমিকা (For Society) ঃ আধুনিক যুগে ব্যক্তিগত, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্র ছাড়াও সামাজিক ক্ষেত্রেও বীমা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। নিম্নে সামাজিক ক্ষেত্রে বীমার গুরুত্ব বা তাৎপর্য বর্ণনা করা হলোঃ

১. বীমা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষায় নিরাপত্তার ভূমিকা পালন করে জীবন বীমা, সাধারণ বীমা ও অগ্নি বীমার মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ যথাযথ ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়ে থাকে।

২. অর্থনৈতিক কল্যাণ যেমন ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় খাতের সর্ব প্রকার আর্থিক ঝুঁকির বড় একটি অংশ বীমা কোম্পানীগুলো বহন করে থাকে।

৩. বীমা জনসাধারণের মধ্যে ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের নিরাপত্তার জন্য জন সচেতনা সৃষ্টি করে। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ উৎসাহিত করে তুলে।

৪. বীমা বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করে ফলে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আনায়নে অবদান রাখে। যার ফলে মানুষের আরও ভোগ বৃদ্ধি পায় যার ফলে জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি পায়।

৫. বীমা বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের ফলে নতুন নতুন কর্ম সংস্থান সৃষ্টি হয়। ফলে বীমা দেশের বেকারত্ব হ্রাস পাবার ক্ষেত্রেও অবদান রাখে।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, বীমা ব্যক্তিগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন আর্থিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে থাকে। এর ফলে এ সকল কর্মকাণ্ডে নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায় ও শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়ন ঘটে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

বীমা ব্যবসায়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও বাংলাদেশে বর্তমান ধারা

(Brief History of Insurance and Its Present Situation in Bangladesh)

বীমার উৎপত্তি সম্পর্কে নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা খুবই দূরুহ। নিকট অতিত থেকে বর্তমান পর্যন্ত সংগৃহীত কিছু ইতিহাস বিভিন্ন গ্রন্থাকার, লেখক ও বিশেষজ্ঞ উপস্থাপন করেছেন। এ থেকে দেখা যায় যে, ভূমধ্যসাগরের উত্তর অঞ্চলে- বিশেষতঃ ইটালিকে কেন্দ্র করে ইউরোপীয় কয়েকটি দেশে ৪র্থ শতাব্দীতে বীমা ব্যবসায়ের প্রচলন শুরু হয়। পরবর্তীতে ইউরোপে শিল্প বিপ্লব এর ফলে ব্যবসায়ের পাশাপাশি বীমারও সম্প্রসারণ ঘটে। ইউরোপের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য গড়ার ফলে অন্যান্য দেশ ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য বীমাকে হাতিয়ার হিসেবে বেছে নেয়। তখন অবশ্য বীমা সমবায়ের মাধ্যমে পরিচালিত হত।

ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম নৌবীমার প্রচলন শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৬৬৬ সালে লন্ডন এবং ১৮৬১ সালে টালি এস্টেটের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ফলে প্রথম ব্রিটেনে আগুনের ক্ষতি মোকাবেলার জন্য অগ্নিবীমা শুরু হয় ১৮৬৫ সালে। অতপর ১৮৯৬ সালে "Hand in Hand" নামক জীবন বীমার উদ্ভব ঘটে ইংল্যান্ডে।

কিন্তু এ উপমহাদেশে ১৮১৮ সালে ইউরোপিয় উদ্যোক্তাগণ কলিকাতায় The Oriental Life Insurance Company নামে একটি জীবন বীমা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বীমা ব্যবসায়ের সূচনা করে। পর্যায়ক্রমে অগ্নি বীমাও নৌ-বীমার গোড়াপত্তন হয়। ১৯২৮ সালে The Indian Insurance Company Act নামে একটি বীমা আইন পাশ করা হয়। ১৯৩৮ সালে তা সংশোধিত, পরিমার্জিত ও সংযোজিত হয়ে তা আবার ঘোষিত হয়।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্তির পর উক্ত আইন তৎকালিন পাকিস্তানে বলবৎ করা হয়। তবে ১৯৫৪ ও ১৯৫৮ সালে কিছু পরিবর্তন করা হয়। ১৯৫৭ সালে ভারতে বীমা ব্যবসা জাতীয় করণ করা হলেও পাকিস্তানে তা ব্যক্তি মালিকানাধীনই থেকে যায়।

১৯৭২ সালের ২৬শে মার্চ Bangladesh Insurance (Emergancy Provision) Order, 1972 জারি করা হয়। এতে ১৯৩৮ সালের বীমা আইনটি বাংলাদেশের বীমা আইন বলে বিবেচিত হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়। পরবর্তীতে একই সালের ৮ই আগস্ট রাষ্ট্রপতির ৯৫ নং আদেশ বলে তৎকালিন ৭৫টি বীমা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করে প্রথমে ৫টি সংস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যথা- ১. বাংলাদেশ জাতীয় বীমা কর্পোরেশন, ২. কর্ণফুলী বীমা কর্পোরেশন, ৩. তিস্তা বীমা কর্পোরেশন, ৪. সুরমা জীবন বীমা কর্পোরেশন এবং ৫. রূপসা জীবন বীমা কর্পোরেশন। অতপর ১৯৭৩ সালের ১৪ই মে বীমা কর্পোরেশন অধ্যাদেশ (Insurance Corporation Ordinance, 1973) ঘোষণার মধ্য দিয়ে ৫টি বীমা সংস্থাকে ২টি সংস্থার অধীনে আনা হয়। যথা- ১। জীবন বীমা কর্পোরেশন ও ২। সাধারণ বীমা কর্পোরেশন।

১৯৮৩ সালে রাষ্ট্রায়ত্ব বীমা কর্পোরেশনের পাশাপাশি ব্যক্তি মালিকানায় বীমা ব্যবসার অনুমতি দেয়া হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচুর বেসরকারী বীমা ব্যবসা চালু আছে। এদের মধ্যে বাংলাদেশ জেনারেল ইনসিউরেন্স কোং লিঃ, ন্যাশনাল লাইফ ইনসিওরেন্স ইত্যাদি উল্লেখ্যযোগ্য। বিদেশী বীমা কোম্পানী ও কাজ করছে। যেমন, আমেরিকান লাইফ ইনসিউরেন্স

কোম্পানী। এমনকি ইসলামী বীমা ব্যবস্থাও চালু হয়েছে। যেমন, ফারইষ্ট ইনসিউরেন্স কোম্পানী লিঃ। প্রতি বৎসরই নতুন নতুন বীমা কোম্পানীর উদ্ভব ঘটছে। বর্তমানে দেশে বীমা ব্যবসা বেশ জনপ্রিয়তা ও লাভ জনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে।

পাঠ-সংক্ষেপ

বীমা মানব জীবনের অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকিকে মোকাবেলা করার এক বড় হাতিয়ার যা ব্যবসা বাণিজ্যকে আরও গতিশীল করতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

মূলতঃ নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে একপক্ষ অপর পক্ষের ঝুঁকি গ্রহণ করার অঙ্গিকার কর যে চুক্তি তাই বীমা।

প্রথমে নৌবীমা নিয়ে শুরু হলেও বর্তমানে জীবন বীমা, অগ্নিবীমা ও সামাজিক বীমার প্রচলন সারা পৃথিবী ব্যাপি।

বীমার মাধ্যমে কোন পক্ষের আর্থিক ক্ষতি হলে বীমাকারী শুধু ক্ষতি পূরণ করে কিন্তু লাভ করতে দেয়া হয়না।

বীমার প্রধানতঃ দুটি পক্ষ থাকে। যথা- ১. বীমাকারী– যে ঝুঁকি গ্রহণ করে, ২. বীমা গ্রহীতা– যে প্রিমিয়ামের বিনিময়ে ঝুঁকি অন্যকে হস্তান্তর করে।

একাধিক পক্ষ, নিশ্চয়তা প্রদান, ঝুকির বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা, সরল বিশ্বাসের চুক্তি, ক্ষতিপূরণের চুক্তি, সমবায় সংস্থা, ঝুঁকি বন্টন ও ঝুঁকি মূল্যায়ন প্রভৃতি বীমার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

বীমা ব্যক্তিগত, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিবিধ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বীমা ব্যবস্থা প্রথমে ইটালীতে ৪র্থ শতাব্দীতে গোড়াপত্তন হয় নৌবীমাকে কেন্দ্র করে। পাক ভারত উপমহাদেশে ১৮১৮ সালে The Oriental Life Insurance নামে একটি জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বীমা ব্যবসায়ের সূচনা হয়।

বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে বীমা ব্যবসা জাতীয়করণ করা হয়। তৎকালিন ৭৫টি বীমা কোম্পানীকে ৫টি সংস্থার অধিনে আনা হয়। যথা- ১. বাংলাদেশ জাতীয় বীমা কর্পোরেশন, ২. কর্ণফুলী বীমা কর্পোরেশন, ৩. তিস্তা বীমা কর্পোরেশন, ৪. সুরমা জীবন বীমা কর্পোরেশন ও ৫. রূপসা জীবন বীমা কর্পোরেশন। ১৯৭৩ সালে এক অধ্যাদেশ বলে (১৪ই মে) ৫টি কে ২টি সংস্থার আওতায় আনা হয়। যথা- ১. সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ও ২. জীবন বীমা কর্পোরেশন। ১৯৮৩ সালে সরকারী বীমার পাশাপাশি বেসরকারী বীমা ব্যবসা শুরু হয়। বর্তমানে ইসলামী বীমারও প্রচলন হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৯.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন--

১. একটি বীমা চুক্তিতে অন্তঃতঃ কতটি পক্ষ থাকে?

ক. ২টি খ. ৩টি গ. ১টি ঘ. ৫টি

২. কোন্টি বীমার বৈশিষ্ট্য নয়?

ক. ঝুঁকি গ্রহণ খ. নিশ্চয়তা প্রদান গ. নিরাপত্তা প্রদান ঘ. জুয়া খেলা

৩. প্রথম কোন দেশে বীমার গোড়া পত্তন হয়?

ক. বাংলাদেশ খ. ইটালী গ. জার্মান ঘ. ইংল্যান্ড

৪. পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কোন্ বীমার প্রচলন হয়?

ক. জীবন বীমা খ. অগ্নী বীমা গ. নৌ-বীমা ঘ. সামাজিক বীমা

৫. পাক-ভারত মহাদেশে কোন সালে প্রথম বীমা ব্যবসা চালু হয়?

ক. ১৮১৮ সাল খ. ১৮০০ সাল গ. ১৮৮১ সাল ঘ. ১৮৩০ সাল

৬. কোন সালে বাংলাদেশে বীমা জাতীয়করণ করা হয়?

ক. ১৯৭২ খ. ১৯৭৩ গ. ১৯৭৫ ঘ. ১৯৮০

৭. প্রথম কয়টি বীমা সংস্থার মাধ্যমে বীমা জাতীয়করণ করা হয়?

ক. ৪টি খ. ৬টি গ. ২টি ঘ. ৫টি

৮. বর্তমানে কতটি সরকারী বীমা কর্পোরেশন আছে।

ক. ১টি খ. ৩টি গ. ৪টি ঘ. ২টি

৯. কোন সালে বাংলাদেশে ব্যক্তি মালিকানায় বীমা ব্যবস্থা চালু হয়?

ক. ১৯৭৫ খ. ১৯৮০ গ. ১৯৮৩ ঘ. ১৯৮৫

পাঠ ২

বীমা চুক্তির বৈশিষ্ট্য ও অপরিহার্য উপাদান
(Insurance Contract,Its Characteristics and Essential Elements)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বীমা চুক্তি সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বীমা চুক্তির বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- বীমা চুক্তির অপরিহার্য উপাদানগুলোর বর্ণনা করতে পারবেন।
- বীমা ব্যবসায়ের মূলনীতিগুলো আলোচনা করতে পারবেন।
- বীমা চুক্তি ও চুক্তির মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

বীমা চুক্তি ঃ বীমা এক ধরনের চুক্তি। সাধারণ অর্থে চুক্তি হলো এক পক্ষ যখন কোন কিছু পাবার উদ্দেশে অন্য পক্ষকে বিনিময় হিসেবে যে প্রতিদান দেবার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় তাই চুক্তি। বীমার ক্ষেত্রে বীমা গ্রহীতা বীমাকারীকে নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে যে ঝুঁকি হস্তান্তর করে তাই হলো বীমা চুক্তি। অধ্যাপক টেলরের মতে, “বীমা চুক্তি হলো প্রিমিয়াম পরিশোধের প্রতিদানে এক পক্ষ অপর পক্ষের সাম্ভাব্য ক্ষতির ঝুঁকি গ্রহণের সম্মতি।” অধ্যাপক এম এন মিশ্রর মতে, “বীমা বলতে বুঝায়, যেখানে প্রিমিয়াম হিসাবে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে হয় এই বিবেচনায় যে, কোন দৈব দূর্ঘটনা সংঘটিত হলে বীমাকারীর নিকট থেকে ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য পার্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাবে। অবশেষে আমরা বলতে পারি যে, বীমা চুক্তি হলো দুটি পক্ষের মধ্যে এমন এক লিখিত যুক্তি যার ফলে এক পক্ষের ভবিষ্যতে ক্ষতি হলে তা পূরণের শর্ত অন্য পক্ষকে নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রিমিয়াম প্রদান করার প্রতিশ্রুতি।

বীমা চুক্তির বৈশিষ্ট্য

আমরা যদি বীমা চুক্তির সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করি তবে বীমার কতকগুলো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। তাই বীমাচুক্তি পর্যালোচনার পর বীমা চুক্তির যে বৈশিষ্ট্যগুলো বেরিয়ে আসে তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো ঃ

১. দুটি পক্ষ ঃ বীমা চুক্তির জন্য অন্ততঃ দুটি পক্ষের প্রয়োজন। যে পক্ষ নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে অন্যকে ঝুঁকি প্রদান করে তাকে বীমা গ্রহীতা বলে। অন্য পক্ষ যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে ঝুঁকি গ্রহণ করে তাকে বীমাকারী বলে।

২. বৈধ চুক্তি ঃ বীমা আইন অনুযায়ী বীমা একটি বৈধ চুক্তি। একটি বৈধ চুক্তির সকল শর্ত এতে বিদ্যমান।

৩. লিখিত চুক্তি ঃ বীমা চুক্তি অবশ্যই লিখিত হতে হবে।

৪. ঝুঁকি গ্রহণ ঃ বীমা চুক্তিতে এক পক্ষ প্রিমিয়ামের বিনিময়ে অপর পক্ষের ঝুঁকি গ্রহণ করে।

৫. অনিশ্চিত চুক্তি ঃ বীমাকারী ও বীমাগ্রহীতা উভয়েই ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ঘটনা সামনে রেখেই চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। সে ঘটনা ঘটতে পারে আবার নাও ঘটতে পারে। জীবন বীমার ক্ষেত্রে অবশ্য কিছুটা ব্যতিক্রম আছে।

৬. শর্ত সাপেক্ষে চুক্তি ঃ ভবিষ্যতে কোন দূর্ঘটনা ঘটলেই কেবল মাত্র বীমাকারী ক্ষতি পূরণ দিবে। অন্যথায় বীমাকারীকে ক্ষতি পূরণ দিতে হবে না।

৭. প্রিমিয়াম ঃ প্রিমিয়াম হলো বীমা গ্রহীতা বীমাকারীকে ঝুঁকি গ্রহণের প্রতিদান হিসেবে যে অর্থ প্রদান করে। প্রিমিয়াম ব্যতিরেকে বীমা চুক্তি হয় না।

৮. বীমাযোগ্য স্বার্থ ঃ বীমা যোগ্য স্বার্থ হলো বীমা গ্রহিতার আর্থিক স্বার্থ। যে বিষয়ে বীমা করা হবে তার উপর বীমা গ্রহীতার বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকতে হবে নতুবা বীমা চুক্তি বৈধ হবে না।

৯. একতরফা দায় ঃ বীমা গ্রহীতা বীমার প্রিমিয়াম প্রদান করার পর বীমাকারীর একক ভাবে চুক্তি অনুযায়ী দায় বহন করবে। তাই বীমা চুক্তিকে একতরফা চুক্তি ও বলা হয়।

১০. ক্ষতি পূরণের চুক্তি ঃ বীমা চুক্তির উদ্দেশ্য হলো প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বীমাকারীর ক্ষতি পুষিয়ে দেয়া। লাভ করার কোন সুযোগ নেই। তাই বেশী পরিমাণ বীমা করা হলেও প্রকৃত ক্ষতির সমপরিমাণ ক্ষতি পূরণ দেয়া হয়। বীমাকারীকে লাভ করতে দেয়া হয় না।

১১. চূড়ান্ত বিশ্বাস ঃ বীমা চুক্তি চূড়ান্ত বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোন পক্ষ কোন প্রয়োজনীয় তথ্য গোপন করলে তা পরে প্রকাশিত হলে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। তাই উভয় পক্ষকেই সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করতে হবে।

বীমাচুক্তির অপরিহার্য উপাদানসমূহ

বীমা চুক্তি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে বীমা চুক্তির দু ধরনের উপাদান আছে। এক চুক্তি হিসেবে চুক্তি আইন অনুসারে সকল উপাদান থাকতে হবে। দুই বীমার জন্য বিশেষ কিছু উপাদান থাকতে হবে। তাই বীমা চুক্তির উপাদানগুলো দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ক) আইনগত বা সাধারণ চুক্তির উপাদান সমূহ এবং

খ) বীমার সাথে সম্পৃক্ত বা বিশেষ উপাদান সমূহ।

ক) আইনগত বা সাধারণ উপাদান সমূহ ঃ বীমা চুক্তি চুক্তি আইন অনুযায়ী একটি চুক্তি। তাই বীমা চুক্তির মধ্যে ১৮৭২ সালের চুক্তি আইনে উল্লিখিত চুক্তির সকল শর্ত বিদ্যমান থাকতে হবে। তাই বীমা চুক্তির মধ্যে যেসব সাধারণ শর্ত বা উপাদান সমূহ থাকতে হবে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

১. একাধিক পক্ষ ঃ যেকোন চুক্তির জন্য অন্ততঃ দু'টি পক্ষ থাকতে হয়। এক পক্ষ অন্য পক্ষের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। বীমার ক্ষেত্রে বীমা গ্রহীতা ও বীমাকারী দুটি পক্ষ থাকে।

২. প্রস্তাব ঃ ১৯৭২ সালের চুক্তি আইনের ২(ক) ধারা অনুযায়ী "যখন কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির সম্মতি লাভের উদ্দেশ্যে কিছু করা বা করা থেকে বিরত থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করে তখন প্রথমোক্ত ব্যক্তি শেষোক্ত ব্যক্তির নিকট একটা প্রস্তাব করেছে বলে ধরে নেয়া হয়।" বীমার ক্ষেত্রেও প্রস্তাব থাকতে হবে।

৩. স্বীকৃতি ঃ যে পক্ষকে প্রস্তাব করা হয় সে পক্ষ যদি কোনরূপ শর্ত যুক্ত না করে প্রস্তাব গ্রহণ করে তবে তাকে স্বীকৃতি বলা হয়। বীমার ক্ষেত্রেও অনুরূপ স্বীকৃতি থাকতে হবে।

৪. সম্মতি ঃ যখন কোন চুক্তির উদ্দেশ্যে উভয় পক্ষ কোন কিছু করা বা না করার জন্য ঐক্যমত পোষণ করে তখন তাকে সম্মতি বলে। এটা চুক্তির অন্যতম শর্ত। বীমার ক্ষেত্রেও অনুরূপ সম্মতি থাকতে হবে।

৫. আইনগত সম্পর্ক ঃ চুক্তির ফলে উভয়ের মধ্যে আইনগত সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। কোন পক্ষ ইচ্ছাকৃত চুক্তি ভঙ্গ করলে অপর পক্ষ ক্ষতি পূরণের জন্য মামলা দায়ের করতে পারে। বীমাচুক্তির ফলে বীমাকারী ও বীমা গ্রহীতা উভয়ের মধ্যে আইনগত সম্পর্ক স্থাপন হয়।

৬. আইনানুগ উদ্দেশ্য ঃ কোন চুক্তির উদ্দেশ্য আইন সিদ্ধ হতে হবে বে আইনী হলে চুক্তি বাতিল হবে। বীমা চুক্তির উদ্দেশ্য আইন সঙ্গত।

৭. চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা ঃ কোন নাবালক, পাগল, দেউলিয়া ও মস্তিষ্ক বিকৃত ব্যক্তি চুক্তি করার অযোগ্য। তাই বীমা করার জন্য ও আইনগত যোগ্যতা থাকতে হবে।

৮. স্বেচ্ছা ও স্বাধীন সায় ঃ চুক্তি আইন অনুযায়ী সায় বা সম্মতি স্বেচ্ছা বা স্বাধীন ভাবে হতে হবে। কোনরূপ বল প্রয়োগ অনুচিৎ প্রভাব, মিথ্যা বর্ণনা বা প্রতারণার মাধ্যমে সায় আদায় করলে চুক্তি বৈধ হবে না। বীমার ক্ষেত্রে সায় স্বাধীন ভাবে হতে হবে।

৯. নির্দিষ্ট বা নিশ্চয়তা ঃ চুক্তি আইনের ২৯ ধারা অনুযায়ী যদি কোন সম্মতির উদ্দেশ্য নির্দিষ্টকারী না হয় তবে তা চুক্তি হবে না। তাই বীমা চুক্তির ক্ষেত্রেও উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট হতে হবে।

১০. চুক্তি পালনের সম্ভাব্যতা বা যৌক্তিকতা ঃ চুক্তি আইনের ৫৬ ধারা অনুসারে কোন অযৌক্তিক বা অবাস্তব কার্য সম্পাদনের জন্য কোন চুক্তি হলে তা অবৈধ হবে। যেমন- মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করার শর্তে প্রচুর অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি।

১১. লিখিত ও নিবন্ধন কৃতঃ চুক্তি হতে হলে কিছু ব্যতিক্রম বাদে চুক্তি অবশ্যই লিখিত হতে হবে। বীমার ক্ষেত্রে চুক্তি লিখিত হতে হবে।

খ) বীমা ব্যবসায়ের সাথে সম্পর্কিত বা বিশেষ উপাদানসমূহ ঃ বীমা চুক্তির জন্য সাধারণ চুক্তির শর্ত ব্যতিরেকে বিশেষ কিছু শর্ত থাকা আবশ্যক নতুবা বীমা চুক্তি হবে না। বীমা চুক্তির বিশেষ উপাদানগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো ঃ

১. বীমা যোগ্য স্বার্থ ঃ বীম যোগ্য স্বার্থ বলতে আর্থিক স্বার্থকে বুঝায়। এর অর্থ হলো বীমাকারী যে বিষয়ে বীমা করছে যদি তা ক্ষতি না হয় তবে সে আর্থিক ভাবে লাভবান হবে আর ক্ষতি হলে আর্থিক ভাবে ক্ষতি গ্রস্ত হবে। বীমা চুক্তি হতে হলে বীমা গ্রহীতার বীমার বিষয় বস্তুর উপর বীমা যোগ্য স্বার্থ থাকতে হবে।

২. চূড়ান্ত বিশ্বাস ঃ এর অর্থ হলো উভয় পক্ষ গুরুত্বপূর্ণ সকল তথ্য একে অপরকে খুলে বলবে। কোন তথ্য গোপন করবে না। যদি গোপন করে এবং তা পরবর্তিতে ধরা পড়ে তবে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। বীমার ক্ষেত্রে এক পক্ষ অপর পক্ষকে অবশ্যই সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য খোলামনে পরিবেশন করবে।

৩. ক্ষতি পূরণ ঃ বীমা চুক্তির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো বীমা গ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতি পূরণ করে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা। কিন্তু বীমার মাধ্যমে বীমা গ্রহীতা লাভ করতে পারবে না। সম্ভাব্য ক্ষতি পূরণের জন্য বীমা করা হয়। লাভ করার জন্য নয়।

৪. স্থলাভিষিক্ততা ঃ বীমা গ্রহীতার কোন বীমাকৃত বস্তু বা সম্পদের ক্ষতি সাধন হলে বীমাকারী ক্ষতি পূরণ করে যাতে বীমাকারী পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে পারে। তবে আরো শর্ত থাকে যে বীমা কারীকে পূর্ণ ক্ষতি পূরণ দেবার পর ক্ষতিগ্রস্ত বস্তুর মালিক তখন বীমাগ্রহীতার স্থলে বীমা কারী হয়। এটাকেই স্থলভিষিক্ততা বলে যা বীমা চুক্তির অপরিহার্য উপাদান।

৬. নিকটতম কারণ ঃ বীমাকৃত বিষয়বস্তু বা সম্পদের ক্ষতি হলে যে কারণে ক্ষতি হয় তা যদি বীমাকৃত থাকে তবে বীমার টাকা পাবে। এ ক্ষেত্রে দূর্ঘটনার সরাসরি কারণ বিবেচ্য বিষয় আনুষঙ্গিক কারণ নয়। যেমন, এক ব্যক্তি দূর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলো পরে সেখানে টিটেনাসে মারা গেল। এখানে মরার কারণ টিটেনাস দুর্ঘটনা নয়।

৭. মনোনয়ন ও অধিকার অর্পন ঃ বীমাগ্রহীতা বীমা করার সময় বিশেষ করে জীবন বীমার ক্ষেত্রে তার মৃত্যুর পর কে বীমার টাকা ভোগ করবে তা উল্লেখ করতে হয় যেটাকে মনোনয়ন বলে। বীমা গ্রহীতা তার বীমার দাবী অন্য কাউকে অর্পন করতে পারে। এটাকে হস্তান্তর বলা হয়। বীমার ক্ষেত্রে মনোনয়নও অর্পন উভয়টাই প্রযোজ্য যা বীমা চুক্তির অপরিহার্য উপাদান।

৮. কিস্তি ফেরত ঃ কোন কোন বীমার ক্ষেত্রে মেয়াদ শেষে কিস্তি ফেরত দেবার বিধান আছে। এ ধরনের বিষয়বস্তু চুক্তিতে উল্লেখ থাকতে হবে।

উপরিউল্লিখিত সাধারণ ও বিশেষ উপাদানগুলো বীমা চুক্তির অপরিহার্য উপাদান। বীমা চুক্তির সময় উভয় ধরনের শর্ত বা উপাদানগুলো অনুসরণ করে বীমা চুক্তি সম্পন্ন করতে হয়।

পাঠ-সংক্ষেপ

বীমাচুক্তি হলো বীমা গ্রহীতা নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে তার জীবন বা সম্পদের ঝুঁকি বীমাকারীর নিকট অর্পণ করা। ফলে বীমা গ্রহীতা ক্ষতি গ্রস্ত হলে বীমাকারী আর্থিক ক্ষতি পূরণ দিতে আইনত বাধ্য থাকে। দুটি পক্ষের মধ্যে এ ধরনের লিখিত চুক্তিই বীমা চুক্তি।

বীমা চুক্তির বৈশিষ্ট্যগুলো হলো দুটি পক্ষ, বৈধ চুক্তি, ঝুঁকি গ্রহণ, অনিশ্চিত চুক্তি, শর্ত সাপেক্ষ চুক্তি, প্রিমিয়াম প্রদান, বীমা যোগ্য স্বার্থ, ক্ষতি পূরণের চুক্তি এবং চূড়ান্ত বিশ্বাসের চুক্তি।

বীমা চুক্তির দু ধরনের উপাদান অপরিহার্য ঃ যথা সাধারণ বা আইন গত উপাদান ও বীমা সংক্রান্ত উপাদান।

সাধারণ উপাদান গুলোর চুক্তি আইনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য উপাদানগুলো প্রযোজ্য। আর এগুলো হলোঃ একাধিক পক্ষ, প্রস্তাব, স্বীকৃতি, প্রতিদান, স্বাধীন বা স্বেচ্ছা সায়, আইনগত সম্পর্ক, আইনানুগ উদ্দেশ্য, নির্দিষ্ট বা নিশ্চয়তা, চুক্তি পালনের সম্ভাব্যতা বা যৌক্তিকতা এবং লিখিত ও নিবন্ধকৃত। পক্ষান্তরে বীমা ব্যবসার সাথে জড়িত বা বিশেষ উপাদানগুলো হলোঃ বীমা যোগ্য স্বার্থ, চূড়ান্ত বিশ্বাস, ক্ষতিপূরণের অঙ্গিকার, স্থলাভিষিক্ততা, নিকটতম কারণ, মনোনয়ন ও অধিকার অর্পন এবং কিস্তি ফেরত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৯.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন--

১. বীমা চুক্তিতে অন্তত কটি কক্ষ থাকতে হবে?

ক. ১টি খ. ২টি

গ. ৩টি ঘ. ৪টি

২. চুক্তি আইন কত সালের?

ক. ১৯৮০ খ. ১৮৭২

গ. ১৮৯০ ঘ. ১৮৮৫

৩. বীমা যোগ্য স্বার্থ কোন ধরনের উপাদান?

ক. আইনগত খ. বিশেষ

গ. উভয়টা ঘ. কোনটাই নয়

৪. চুক্তি করতে হলে কত বৎসর বয়স প্রয়োজন?

ক. ১৫ খ. ২০

গ. ১৮ ঘ. ২১

৫. বীমা চুক্তির অপরিহার্য উপাদান কয় প্রকার?

ক. ২ খ. ১

গ. ৩ ঘ. ৫

৬. নিম্নলিখিত কোন্‌টি বীমার বৈশিষ্ট্য নয়?

ক. প্রিমিয়াম প্রদান খ. ঝুঁকি গ্রহণ

গ. লিখিত চুক্তি ঘ. মৌখিক চুক্তি

৭. প্রস্তাব ও স্বীকৃতি কোন্ ধরনের উপাদান?

ক. আইনগত খ. বিশেষ

গ. উভয়টাই ঘ. কোনটাই নয়।

পাঠ ৩ বীমা ব্যবসায়ের মূল নীতিসমূহ ও বীমার শ্রেণী বিভাগ
(Basic Principles of Insurance Business and Its Classification)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বীমার মূলনীতিগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বীমা চুক্তি ও বাজী চুক্তির মধ্যে পার্থক্য করতে পারবেন।
- বীমার শ্রেণী বিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

বীমা চুক্তির বা বীমা ব্যবসায়ের নীতি সমূহ (Principles of Insurance Business)

বীমা ব্যবসা কতকগুলো মৌলিক নীতিমালার উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। বীমার মৌলিক নীতিমালাগুলো হলো ঃ

বীমা যোগ্য স্বার্থ, চূড়ান্ত বিশ্বাসের চুক্তি, বীমা চুক্তি ক্ষতি পূরণের চুক্তি, ক্ষতি পূরণের ক্ষেত্রে নিকটতম কারণটি দূরের কারণ নয়, স্থলাভিষিক্ত নীতি, আনুপাতিক অংশ গ্রহণের নীতি, সম্ভাবনার নীতি প্রভৃতি। নিম্নে বীমার মূলনীতিগুলো আলোচনা করা হলোঃ

১. বীমা যোগ্য স্বার্থের নীতি ঃ বীমাযোগ্য স্বার্থ হলো বীমা গ্রহীতা যে বিষয়ের উপর বীমা করতে ইচ্ছুক তার সাথে বীমা গ্রহীতার আর্থিক স্বার্থ জড়িত আছে। এর অর্থ হলো বীমার বিষয়বস্তু নিরাপদে থাকলে বীমা গ্রহীতা আর্থিকভাবে লাভবান হবেন আর ক্ষতিগ্রস্থ হলে আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবেন। এক কথায় বীমাযোগ্য স্বার্থ হলো বীমার বিষয়বস্তুর সাথে বীমা গ্রহীতার একটি আর্থিক স্বার্থ।

বৈধ বীমাযোগ্য স্বার্থের আবশ্যকীয় উপাদানসমূহ ঃ বীমাযোগ্য স্বার্থ হতে হলে চারটি পূর্বশর্ত পূরণ করতে হবে। এগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

ক) বীমা যোগ্য স্বার্থের বিষয়বস্তু বিদ্যমান থাকতে হবে ঃ বীমা যোগ্য স্বার্থ হতে হলে বীমার বিষয়বস্তুর অস্তিত্ব থাকতে হবে। অর্থাৎ বাস্তবে অস্তিত্ব না থাকলে সে বিষয়ের উপর বীমা যোগ্য স্বার্থ থাকে না ও তার উপর বীমাও করা যায় না।

খ) আর্থিক সম্পর্ক ঃ বীমা গ্রহীতার বীমার বিষয়বস্তুর সাথে আর্থিক স্বার্থ থাকতে হবে। অন্যের সম্পত্তির উপর বীমা যোগ্য স্বার্থ না থাকায় বীমা করা যায় না।

গ) বিষয়বস্তুর সাথে আইনগত স্বার্থ ঃ কোন বিষয়বস্তুর সাথে আইনগত স্বার্থ না থাকলে বীমা যোগ্য স্বার্থ জন্মায় না। যেমন কোন চোর তার চুরীকৃত মালের উপর আইনগত স্বার্থ নেই বলে তার বীমাযোগ্য স্বার্থ নেই। সে উক্ত বিষয় বস্তুর উপর বীমাও করতে পারবে না।

ঘ) আর্থিক লাভ ক্ষতি ঃ প্রস্তাবিত বীমার বিষয় বস্তুর সাথে বীমা গ্রহীতার এমন আর্থিক বৈধ-আর্থিক স্বার্থ জড়িত থাকতে হবে যে, উক্ত বিষয়বস্তু বিদ্যমান থাকলে যে আর্থিক ভাবে লাভবান হবে তার ক্ষতিগ্রস্ত হলে আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

বীমাযোগ্য স্বার্থের কতিপয় উদাহরণ নিম্নে দেয়া হলো ঃ

i) কোন সম্পদের মালিকের তার সম্পদের উপর বীমাযোগ্য স্বার্থ আছে।

ii) বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকী সম্পত্তির উপর বীমাযোগ্য স্বার্থ আছে।

iii) বীমাকারী তার বীমাকৃত বিষয়ের উপর পুনঃ বীমাযোগ্য স্বার্থ আছে।

iv) স্বামী স্ত্রীর উপর এবং স্ত্রী স্বামীর উপর বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকে।

v) দেনাদারের উপর পাওনাদারের বীমাযোগ্য স্বার্থ বিদ্যমান।

কখন বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকতে হবে ঃ বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকার বিষয়ে বীমার শ্রেণীবিভাগের উপর নির্ভর করে।

নৌ-বীমার ক্ষেত্রে ঃ বীমা দাবী করার সময় বীমা যোগ্য স্বার্থ থাকা আবশ্যক। তবে বীমা করার সময় প্রমাণ করতে হবে যে অতিশীঘ্রই তিনি উক্ত বিষয় বস্তুর উপর বীমাযোগ্য স্বার্থ অর্জন করতে যাচ্ছে।

অগ্নিবীমার ক্ষেত্রে ঃ অগ্নিবীমার ক্ষেত্রে বীমা পলিসি গ্রহণ করার সময় ও বীমা পলিসি দাবী করার সময় অর্থাৎ উভয় সময়ই বীমা যোগ্য স্বার্থ থাকতে হবে।

জীবন বীমার ক্ষেত্রে ঃ জীবন বীমার ক্ষেত্রে বীমা পলিসি গ্রহণ করার সময় অবশ্যই বীমা যোগ্য স্বার্থ থাকতে হবে। বীমার টাকা দাবী করার সময় বীমা যোগ্য স্বার্থ থাকা আবশ্যক নয়। যেমন, মিঃ কাফির তার স্ত্রী মেরীর জন্য একটি জীবন বীমা পলিসি গ্রহণ করে। কিন্তু কিছুদিন পর তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ হয় এবং সে ভদ্র মহিলা পরে মারা যায়। এক্ষেত্রে যদিও সে তার স্ত্রী নাই তবুও সে বীমার টাকা পাবার অধিকারী।

দুর্ঘটনা বীমা ঃ অগ্নিবীমার ন্যায় দূর্ঘটনার বীমার ক্ষেত্রে উভয় সময়েই বীমা যোগ্য স্বার্থ থাকতে হবে।

২. চূড়ান্ত বিশ্বাসের নীতি ঃ বীমার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বিশ্বাসের নীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ নীতি অনুসারে উভয় পক্ষ সরল বিশ্বাসে বীমা সংক্রান্ত সকল বিষয় একে অপরের নিকট অকপটে উপস্থাপন করবে। যদি কোন পক্ষ গুরুত্ব পুর্ণ কোন তথ্য ইচ্ছাকৃত ভাবে গোপন করে তবে পরবর্তিতে তা প্রকাশ পেলে বীমা চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। মূল কথা হলো বীমাচুক্তিতে সব প্রয়োজনীয় বিষয় প্রকাশ করতে হবে। যে সকল তথ্য প্রকাশ করা হবে তা সম্পূর্ণ সঠিক হতে হবে এবং তা সমভাবে উভয় পক্ষের জন্যই প্রযোজ্য।

৩. ক্ষতিপূরণের নীতি ঃ এ নীতি অনুসারে কোন বীমা গ্রহীতা যে বিষয় বস্তুর উপর বীমা গ্রহণ করবে তার যে পরিমাণ ক্ষতি হবে শুধু ততটুকু ক্ষতি পূরণ দেয়া হবে। এর অর্থ হলো বীমা গ্রহীতাকে বীমা করে আর্থিক ভাবে লাভবান হতে দেয়া হবে না। যদি কেউ বেশী বীমা করে থাকে তাহলেও প্রকৃত ক্ষতি পূরণ দেয়া হবে। আবার কেউ যদি একাধিক বীমা করে থাকে তবে সব মিলিয়ে তার ক্ষতির বেশী দেয়া হবে না। তবে জীবন বীমার ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। যেমন, যদি কেউ তার জীবনের উপর ৫ লক্ষ করে ১০টি বীমা করে তার মৃত্যুতে ৫ লক্ষ করে ১০টি বীমার টাকাই তার নোমিনি পাবে। কারণ মানুষের জীবনের মূল্য টাকার দ্বারা পরিমাপ করা যায় না। তাই জীবন বীমার ক্ষেত্রে ক্ষতি পূরণের নীতি প্রযোজ্য নহে। জীবন বীমার ন্যায় ব্যক্তিগত দূর্ঘঠনার বীমার ক্ষেত্রেও ক্ষতি পূরণের নীতি প্রযোজ্য নয়।

৪. প্রতিস্থাপনের নীতি ঃ বীমার মূল উদ্দেশ্য হলো কোন বীমা গ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাকে ক্ষতি পুষিয়ে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা। বীমার মাধ্যমে আর্থিক ভাবে লাভবান করা বা হওয়া উদ্দেশ্য নয়। তাই কোন ক্ষতি হবার পর তাকে ক্ষতি পূরণ করার পর অন্য কোন উৎস থেকে বীমা গ্রহীতা আর কোন অর্থ পাবার অধিকারী হয় না। সেক্ষেত্রে বীমা গ্রহীতার স্থলে বীমাকারী তার অধিকারী হবে। যেমন, একজন বীমাগ্রহীতা বীমাকৃত গাড়ীটি দূর্ঘটনায় সম্পূর্ণ অকেজ হয়ে গেল। সেক্ষেত্রে বীমাকারী তাকে একটি নতুন গাড়ী দিল। কিন্তু ধ্বংসকৃত গাড়ীটি চালানর উপযোগী না হলেও বিক্রয় করে এর থেকে অর্থ আয় করা সম্ভব। এক্ষেত্রে এই সম্পদ বা প্রাপ্ত অর্থের মালিক বীমাগ্রহীতার স্থলে বীমাকারী হবে। ক্ষতি পূরণ নীতির ন্যায় প্রতি স্থাপনের বীমা চুক্তি নৌ ও অগ্নি বীমার উপর প্রযোজ্য কিন্তু জীবন বীমার উপর প্রযোজ্য নয়। ক্ষতিপূরণ নীতি ও স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি দ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ ঃ

ক) ক্ষতি পুরণের নীতি যেখানে শেষ স্থলাভিষিক্ত করণ সেখান থেকেই শুরু।

খ) ক্ষতিপূরণ বীমাগ্রহীতা পান- কিন্তু স্থলভিষিক্ত হয় বীমাকারীর।

গ) ক্ষতি পূরণের পরিমাণ বেশী- স্থলাভিষিক্ত করনের আর্থিক পরিমাণ কম।

ঘ) ক্ষতিপূরণের অর্থ পাওয়া যায় বীমাকারীর নিকট থেকে। পক্ষান্তরে স্থলাভিষিক্ততার আর্থিক সুবিধা আসে তৃতীয় পক্ষ থেকে।

ঙ) ক্ষতি হলেই বীমা গ্রহীতা ক্ষতি পূরণ পাবে। কিন্তু স্থলাভিষিক্ততার ক্ষেত্রে বীমা গ্রহীতার সম্পূর্ণ ক্ষতি পূরণ দেবার পরই মাত্র অবশিষ্ট সুবিধা বীমাকারী স্থলাভিষিক্ততার নীতি আর্থিক সুবিধা পাবে।

৫. নিকটতম কারণ নীতি বা মতবাদ ঃ এ নীতি অনুযায়ী বীমা গ্রহীতা বীমার টাকা পাবার ক্ষেত্রে নিকটতম কারণটি বিবেচনা করা হবে দূরের কারণটি নয়। যেক্ষেত্রে কোন ক্ষতির সাথে একাধিক কারণ জড়িত তার মধ্যে যে কারণটি নিকটতম সেটাকেই ক্ষতির কারণ বলে বিবেচনা করা হয়। যদি সেটা বীমাকৃত হয় তবেই মাত্র বীমার টাকা পাওয়া যাবে। যেমন, একটি জাহাজ সমুদ্রিক বীমা করা আছে এবং তাহলো জলচ্ছাসের বিরুদ্ধে। একটি জাহাজের তলা ইদুরে কেটে ফেলে এবং জাহাজটি পানিতে ডুবে বীমাকৃত জাহাজটি ধ্বংস হয়ে যায়। এক্ষেত্রে জাহাজ ডুবির নিকটতম কারণটি হলো ইদুর পানি নয়।

যেহেতু ইদুরের কোন বীমা গ্রহণ করা হয়নি বিধায় ক্ষতিগ্রস্ত মালিক কোন আর্থিক ক্ষতিপূরণ পাবে না। আর একটি উদাহরণের মাধ্যমে নিকটতম কারণ নীতি বা মতবাদ বুঝান হলো। ধরা যাক মিঃ জাফর একটি দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার সময় আবার সে টিটেনাসে আক্রান্ত হয় এবং মৃত্যুবরণ করে। এক্ষেত্রে মিঃ জাফরের মৃত্যুর নিকটতম কারণ টিটেনাস, দুর্ঘটনা নয়। যদি শুধুমাত্র দূর্ঘটনার জন্য বীমা করা থাকে তবে সে কোন ক্ষতি পূরণ অর্থাৎ বীমার টাকা পাবে না।

৬. অবদানের নীতি ঃ ক্ষতিপূরণের নীতিকে কার্যকর করার জন্য অবদানের নীতি প্রয়োগ করা হয়। এক্ষেত্রে যদি একটি ব্যক্তির কোন বিষয়বস্তুর উপর একাধিক বীমা করা থাকে সেক্ষেত্রে কোন ক্ষতি হলে সে ক্ষতি পূরণ সকলে আনুপাতিক হারে দিবে যাতে করে বীমা গ্রহীতা ক্ষতির চেয়ে বেশী আয় না করতে পারে। ধরা যাক মিঃ কোরবান তার একটি বাড়ী অগ্নিবীমার জন্য ৫,০০,০০০/- করে তিনটি বীমা কোম্পানীর নিকট বীমা করল। অগ্নিকাণ্ডের ফলে ১,০০,০০০ টাকার ক্ষতি হলো। সেক্ষেত্রে সকলে মিলে ১,০০,০০০ টাকা ক্ষতি পূরণ দিবে আনুপাতিক হারে। তবে জীবন বীমা ও ব্যক্তিগত দূর্ঘটনা বীমার ক্ষেত্রে এ নীতি প্রযোজ্য নয়।

বীমাচুক্তি ও বাজি চুক্তির মধ্যে পার্থক্য

বীমাচুক্তি ও বাজি চুক্তি এক নয়। এ দু চুক্তির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে বীমা চুক্তিও বাজি চুক্তির মধ্যে পার্থক্য দেখান হলো ঃ

১. এক পক্ষ অন্যপক্ষকে কিস্তিতে বা এক কালিন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের মাধ্যমে তার ঝুঁকিকে হস্তান্তর করে এর ফলে অন্য পক্ষ ১ম পক্ষের ক্ষতি হলে ক্ষতি পূরণ করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে যে চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তাকে বীমা চুক্তি বলে। পক্ষান্তরে ভবিষ্যতে কোন ঘটনা ঘটা বা না ঘটার ফলে এক পক্ষ অন্য পক্ষকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের যে চুক্তি বদ্ধ হয় তাকে বাজি চুক্তি বলে।

২. বীমা চুক্তি আইনত বৈধ কিন্তু বাজি চুক্তি আইনত অবৈধ।

৩. বীমার ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর উপর এক পক্ষের আর্থিক স্বার্থ জড়িত থাকে। কিন্তু বাজির ক্ষেত্রে বাজির বিষয়ের উপর উভয় পক্ষের আর্থিক সম্পর্ক জড়িত থাকে।

৪. প্রতিদান ঃ বীমা চুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিদান প্রয়োজন। কিন্তু বাজির ক্ষেত্রে কোন বৈধ প্রতিদান থাকে না।

৫. বীমার উদ্দেশ্য হলো সম্ভাব্য দায় বা ঝুঁকি এড়ান। কিন্তু বাজির ক্ষেত্রে জুয়া খেলা ব্যতিত কোন উদ্দেশ্য থাকে না।

৬. বীমা চুক্তি চূড়ান্ত বিশ্বাসের চুক্তি, পক্ষান্তরে বাজি চুক্তি জুয়া খেলা বা ফাঁকি বাজির চুক্তি।

৭. বীমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি পক্ষান্তর বাজির ক্ষেত্রে ক্ষতি পূরণের কোন বিধান নেই।

বীমার শ্রেণী বিভাগ

নৌবীমা দিয়ে বীমার যাত্রা শুরু হলেও পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রকার বীমার জন্ম হতে থাকে। আধুনিক যুগে বিভিন্ন প্রকার বীমা দেখা যায়। আমরা বীমাকে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণী বিভাগ করতে পারি। যথা- ১. কারবারী দৃষ্টিকোণ থেকে বীমার শ্রেণী বিন্যাস ও ২. ঝুঁকির দৃষ্টিকোণ থেকে বীমার শ্রেণী বিন্যাস।

নিম্নে উভয়দিক থেকে একটি সমন্বিত ও সংক্ষিপ্ত আকারে বিভিন্ন প্রকার বীমার বর্ণনা দেয়া হলো।

১. জীবন বীমা ঃ যে বীমার বিষয়বস্তু মানুষের জীবন তাকে এক কথায় জীবন বীমা বলে। এক্ষেত্রে নিজের জীবন বা আর্থিক স্বার্থ যুক্ত অন্যের জীবনের উপর বীমা করা যায়। জীবন বীমা অন্যান্য বীমা থেকে একটু পার্থক্য। অন্যান্য বীম ক্ষতি পূরণের বীমা। কিন্তু জীবন বীমা ক্ষতি পূরণের বীমা নয়। কারণ মানুষের জীবন অর্থের মানদণ্ডে বিচার করা যায় না। জীবন বীমা ও আবার বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। যেমন, মেয়াদী বীমাও সাময়িক বীমা। জীবন বীমার অর্থ হলো কারো মৃত্যু হলে যাতে তার নির্ভরশীলরা অর্থাভাবে না পতিত হয় অথবা বৃদ্ধ বয়সে যখন কর্মক্ষমতা থাকে না তখন আর্থিক নিশ্চয়তা থাকে। পরবর্তী ইউনিটে জীবন বীমা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

২. সাধারণ বীমা ঃ জীবন বীমা ব্যতিত অন্যান্য প্রায় সকল বীমা ব্যবসা সাধারণ ভাবে পরিচালিত হয় বলে এ ধরনের বীমা ব্যবসাকে সাধারণ বীমা বলা হয়। সম্পত্তি বীমা যথা ঃ নৌ-বীমা ও অগ্নিবীমা, দায় বীমা ও অন্যান্য বীমা সাধারণ বীমার আওতায় পড়ে।

কারবারী দৃষ্টিকোন থেকে বীমার শ্রেণী বিভাগ ঃ

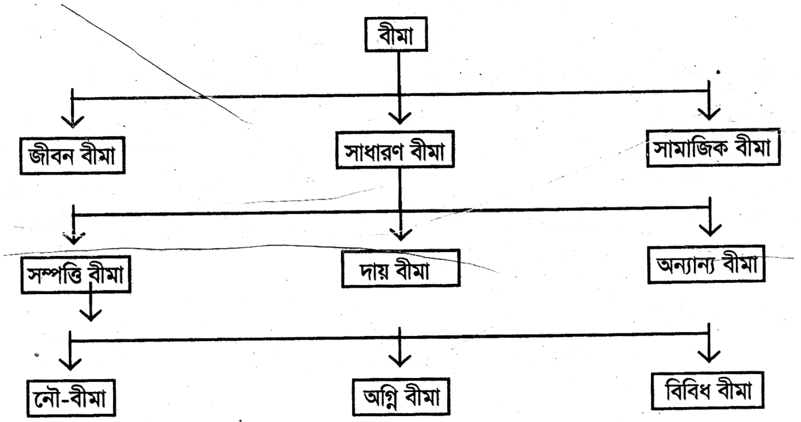
বীমা
জীবন বীমা
সাধারণ বীমা
সামাজিক বীমা
সম্পত্তি বীমা
দায় বীমা
অন্যান্য বীমা
নৌ-বীমা
অগ্নি বীমা
বিবিধ বীমা

উৎস ঃ Insurance - Principles and Practices by M.N. Mishra.

ক) সম্পত্তি বীমা ঃ সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য যে বীমা করা হয় তাই মূলতঃ সম্পত্তি বীমা। এতে সম্ভাব্য ক্ষতি পূরণের অঙ্গীকার থাকে। সম্পত্তি বীমা মূলতঃ দুধরনের। যথা- নৌ-বীমা ও অগ্নিবীমা।

i) নৌ-বীমা ঃ ব্যবসা বাণিজ্যের প্রায় অধিকাংশ পণ্যই নৌ পথে পরিবাহিত হয়, যদিও বর্তমানে এর পরিমাণ দিন দিন কমছে। দেশের মধ্যে ও বিদেশের সাথে পণ্য চলাচলের পথে অনেক ধরনের বাধা বিপত্তি জড়িত থাকে। এ ধরনের বিপদ থেকে রেহাই পাবার লক্ষ্যে বীমা গ্রহীতা নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে ঝুঁকি থেকে রেহাই পাবার জন্য বীমাকারীর সাথে যে চুক্তিবদ্ধ হয় তাই মূলতঃ নৌ-বীমা।

নৌ-বীমার বিষয় বস্তু হলো নৌ-যান, জাহাজ বা জাহাজের পণ্য আনা মাশুল বা ভাড়া ইত্যাদি। এর যেকোন ক্ষতি হলে তা পূরণের অঙ্গীকার হলো নৌ-বীমা। নৌ-বীমা ক্ষতি পূরণের চুক্তি। নৌ-বীমা বিশ্বে প্রথম আত্ম প্রকাশ করে বলে বিশেষজ্ঞগণ ধারণা করেন।

ঝুঁকির দিক থেকে বীমার শ্রেণী বিভাগ নিম্নরূপঃ

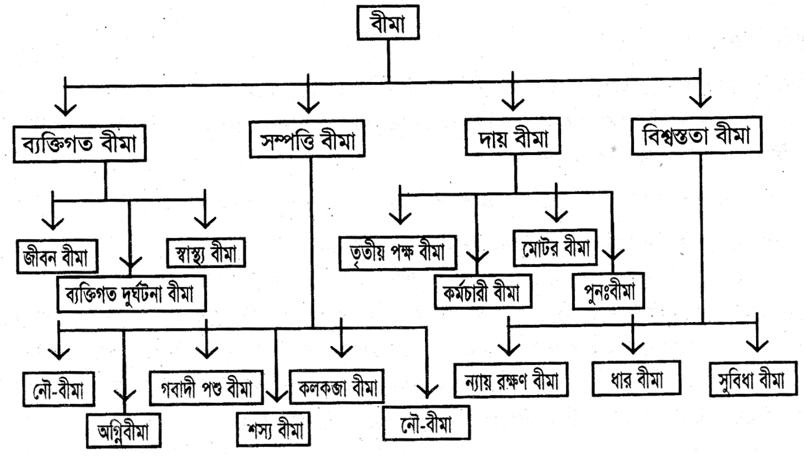
বীমা
ব্যক্তিগত বীমা
সম্পত্তি বীমা
দায় বীমা
বিশ্বস্ততা বীমা
জীবন বীমা
স্বাস্থ্য বীমা
ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বীমা
তৃতীয় পক্ষ বীমা
মোটর বীমা
কর্মচারী বীমা
পুনঃবীমা
নৌ-বীমা
অগ্নিবীমা
গবাদী পশু বীমা
শস্য বীমা
কলকব্জা বীমা
নৌ-বীমা
ন্যায় রক্ষণ বীমা
ধার বীমা
সুবিধা বীমা

উৎস ঃ Insurance - Principles and Practices by M.N. Mishra

ii) অগ্নিবীমা ঃ আগুন মানব জীবনের সাথে গভীর ভাবে জড়িত। এটা যেন আমাদের জন্য আবশ্যক। আবার মাঝে মাঝে আগুন আমাদর জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাড়ায়। প্রতি বছর পৃথিবীর সবদেশেই কম বেশী অগ্নিকাণ্ড ঘটে যা অর্থনীতির চাকাকে মন্থর করে দেয়। তাই আগুনের বিপদ থেকে রক্ষা করার মানসে যে বীমা করা হয় তাই অগ্নি বীমা। অগ্নিবীমা হলো অগ্নি ঝুঁকি ও ক্ষতির বিরুদ্ধে অত্যন্ত শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।

iii) বিবিধ বীমা ঃ পণ্য সামগ্রী, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, যানবাহন ইত্যাদি সম্পদকে দুর্ঘটনার কবল থেকে রক্ষা পাবার লক্ষ্যে যে বীমা করা হয় তাই বিবিধ বীমার অন্তরগত। এক্ষেত্রে পৃথক পৃথক বীমা ব্যবস্থা চালু আছে। যেমনঃ মোটর বীমা শস্য, চোট বীমা, চৌর্য বীমা, আসবাপত্র বীমা, গবাদী পশু বীমা ইত্যাদি।

খ) **দায় বীমা ঃ** বীমা চুক্তি অনুযায়ী সম্পদের বা ব্যক্তিগত দূর্ঘটনা বা মৃত্যুর জন্য ক্ষতির দায় পূরণ করার লক্ষ্যে যে চুক্তি করা হয় তাকে দায় বীমা বলে। এটাও সাধারণ বীমার অন্তর্গত।

গ) **অন্যান্য ধরনের বীমা ঃ** উপরোক্ত বীমা সমূহ ব্যতিত আরো কিছু বীমা আছে যেগুলো সাধারণ বীমার আওতাভুক্ত। যেমন- রপ্তানী বীমা, কর্মচারী বীমা ইত্যাদি। এসকল বীমা দিন দিন জনপ্রিয়তা লাভ করছে।

৩. সামাজিক বীমা ঃ সমাজের অসমর্থ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য বিশেষ ধরনের বীমার ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন- অক্ষমতা বীমা, অসুস্থতা বীমা, পেনসন বীমা শিল্প বীমা ইত্যাদি।

পাঠ-সংক্ষেপ

বীমা ব্যবসায় কয়েকটি মৌলিক নীতিমালার উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। যথাঃ বীমাযোগ্য স্বার্থ, চূড়ান্ত বিশ্বাস, ক্ষতি পূরণের নীতি নিকটতম কারণ মতবাদ, স্থলাভিষিক্ত নীতি, আনুপাতিক অংশগ্রহণের নীতি ইত্যাদি।

বীমা চুক্তি ও বাজী চুক্তির মধ্যে বেশ কয়েকটি পার্থক্য রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলোঃ বীমা বৈধ চুক্তি, বাজি অবৈধ চুক্তি, বীমা ক্ষতি পূরণের চুক্তি বাজি চুক্তি ফকির চুক্তি। বীমার ক্ষেত্রে বৈধ প্রতিদান থাকে কিন্তু বাজির ক্ষেত্রে প্রতিদানের বালাই নেই। বীমার ক্ষেত্রে বীমা যোগ্য স্বার্থ থাকতে হয় অর্থাৎ বীমাগ্রহীতার বিষয় বস্তুর সাথে আর্থিক সম্পর্ক থাকে, পক্ষান্তরে বাজিচুক্তির ক্ষেত্রে বাজির বিষয় বস্তুর সাথে কোন পক্ষের অর্থনৈতিক সম্পর্ক নেই।

বিভিন্ন প্রকার বীমার প্রচলন আছে, তন্মধ্যে জীবন বীমা, নৌ-বীমা, অগ্নিবীমা, দুর্ঘটনা বীমা, সামাজিক বীমা, মটর বীমা, গবাদীপশু বীমা, শস্য বীমা ও চৌর্য বীমা বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৯.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন--

১. নিম্নের কোন্‌টি বীমার নীতি নয়?

ক. বীমা যোগ্য স্বার্থ　　খ. ক্ষতি পূরণের নীতি

গ. দূরের কারণ মতবাদ　　ঘ. নিশ্চয়তা প্রদান

২. অগ্নিবীমায় কখন বীমা যোগ্য স্বার্থ থাকতে হয়?

ক. বীমা পলিসি গ্রহণের সময়　　খ. বীমার টাকা দাবী করার সময়

গ. উভয় সময়　　ঘ. কোনটাই নয়।

৩. কোন্‌ বীমার ক্ষেত্রে ক্ষতি পূরণের নীতি প্রযোজ্য নয়?

ক. জীবন বীমার ক্ষেত্রে　　খ. অগ্নিবীমার ক্ষেত্রে

গ. নৌ-বীমার ক্ষেত্রে　　ঘ. কোনটাই নয়।

৪. নিকটতম কারণ মতবাদ কোন্‌ বীমার জন্য প্রযোজ্য?

ক. শুধু জীবন বীমার ক্ষেত্রে　　খ. শুধু নৌ-বীমার ক্ষেত্রে

গ. শুধু অগ্নি বীমার ক্ষেত্রে　　ঘ. সকল বীমার ক্ষেত্রে

৫. কোন বীমার ক্ষেত্রে নিশ্চিত ভাবে বীমাকারীর নিকট থেকে দাবী পাওয়া যায়?

ক. জীবন বীমা　　খ. অগ্নিবীমা

গ. নৌ-বীমা　　ঘ. কোনটাই নয়।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৯.১

১.ক ২.ঘ ৩.খ ৪.গ ৫.ক ৬.ক ৭.ঘ ৮.ঘ ৯.গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৯.২

১.খ ২.খ ৩.খ ৪.গ ৫.ক ৬.ঘ ৭.ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৯.৩

১.গ ২.গ ৩.ক ৪.ঘ ৫.ক।

রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১. বীমা বলতে কি বুঝেন? বীমার বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করুন।
২. বীমার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
৩. বীমার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করুন।
৪. বীমা চুক্তি বলতে কি বুঝেন?
৫. বীমা চুক্তির বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করুন।
৬. বীমার আইন গত উপাদানগুলো কি কি?
৭. বীমার বিশেষ উপাদান গুলো ব্যাখ্যা করুন।
৮. বীমাযোগ্য স্বার্থ কি?
৯. বীমাযোগ্য স্বার্থের অপরিহার্য উপাদানগুলো কি কি?
১০. কোন্ বীমার ক্ষেত্রে কখন বীমা যোগ্য স্বার্থ থাকতে হবে?
১১. বীমাযোগ্য স্বার্থের ৫টি উদাহরণ দিন।
১২. “চূড়ান্ত বিশ্বাসের চুক্তি বীমা চুক্তি” আলোচনা করুন।
১৩. ক্ষতিপূরণের নীতি ও প্রতিস্থাপনের নীতি বর্ণনা ও এদুই নীতির মধ্যে পার্থক্য করুন।
১৪. নিকটতম কারণ মতবাদ ও অবদানের নীতি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।
১৫. বীমা চুক্তি ও বাজি চুক্তি কি এক? যদি না হয় তবে কেন?
১৬. বিভিন্ন ধরনের বীমার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।